তত্ত্বের উপর একটি নিবন্ধ লিখ

বঙ্গভঙ্গের কারণ ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের কারণ: বঙ্গভঙ্গের মূল যে কারণ তা হল, বাংলা প্রেসিডেন্সির বিশাল আয়তন হওয়ার কারণে ব্রিটিশরা এদেশেকে শাসন-শোষনে বেশি সুবিধা করতে পারছে না। অপরদিকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (আই.এন.সি) ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপকে থামিয়ে দিতে বাংলাকে বিভাজন করার প্রয়োজন মনে করেন। এর পরেও বঙ্গভঙ্গের পেছনে আরো সুদূর প্রসারি কারণ আছে যা নিচে উল্লেখ করা হলঃ-

১। প্রশাসনিক কারণঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ হল প্রশাসনিক কারণ। বাংলা ছিল বিশাল প্রদেশ যার আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। ফলে শাসনভার ছিল কষ্টসাধ্য। লর্ড কার্জন প্রথম থেকেই একে প্রশাসনিক সংস্কার নামে অভিহিত করেন।

২। রাজনৈতিক কারণ: পাশ্চাত্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এসব আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। ঢাকাকে রাজধানী করে সরকার আন্দোলনকে সন্নিমিত করতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের পেছনে নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল-

ক) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করা : ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে 'বাংলা প্রেসিডেন্সিতে' জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা শহর। সুচতুর ইংরেজ সরকার এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ এবং আন্দোলনকারীদের মেরুদন্ড- ভেঙ্গে দেয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গ করতে উদ্যোগী হয়। ব্রিটিশ সরকার 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি অবলম্বন করে।

খ) মুসলমানদের দাবি : স্যার সলিমুলস্নাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পাবে। হিন্দু সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকাতার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। মুসলমান জনগণ চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

গ) আধা-সামনত্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : পূর্ব বাংলায় আধা-সামনত্মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী একটি এলিট শ্রেণী গড়ে ওঠে; তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানায়।

৩। অর্থনৈতিক কারণঃ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পূর্বে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যি, অফিস-আদালত, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই কলকাতার কেন্দ্রিভূত ছিল। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা সর্বত্রই পিছিয়ে পড়েছিল। অধিকাংশ মুসলমান জনগণ তখন ভাবতে শুরু করে যে, বঙ্গভঙ্গ হলে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের সুযোগ পাবে। এ জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

৪। সামাজিক কারণ : ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমান সম্প্রদায় নির্মমভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি এবং মুসলমানদের প্রতি বৈরী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানরা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন একটি দরিদ্র, রিক্ত ও নিঃস্ব সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সুতরাং লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবঙ্গের চিনত্মা-ভাবনা শুরু হলে পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই এর প্রতি সমর্থন জানায়। বঙ্গবঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ তাদের হারানো প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

৫। ধর্মীয় কারণ : অবিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশে মুসলমানগণ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পশ্চিম অংশে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও দুই সম্প্রদায়ের জন্য দুটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৬। কংগ্রেসকে দুর্বল করা: ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শুরু থেকেই ব্রিটিস বিরোধীভাবাপন্ন হলেও বঙ্গভঙ্গ যখন প্রস্তাব হয় কংগ্রেস তখন থেকেই এর বিরোধিতা করেন। কার্জন বিশ্বাস করতো কলকাতায় কিছু ষড়যন্ত্রকারী আমার বক্তব্য কংগ্রেসে চালাতো। কাজেই কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস করে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করলে ষড়যন্ত্রকারীরা সে সুযোগ আর পাবে না। তারা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়বে।

৭। সরকারি চাকরিতে সমস্য: সে সময়ের হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি সরকারি চাকরির সুবিধা পেত। এক্ষেত্রে মুসলিমরা ছিল পিছিয়ে। মুসলিমরা যাতে সমানভাবে সরকারি চাকরি করতে পারে এ জন্য বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিমরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ সহ প্রায় সব মুসলিম নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল।

৮। পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্য: পূর্ব বাংলায় পাট উৎপাদন হতো বেশি কিন্তু পাটকল ছিল না। পাটকল ছিল কলকাতায় ও হুগলিতে। এ জন্য পূর্ববাংলার জনগণ পাটের উপযোক্ত মূল্য পেত না। এ জন্য পূর্ব বাংলার জনগন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল। আর পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফলঃবঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল সাময়িক হলেও বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় বেশী লাভবান হয়েছিল।

১) মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া : বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশ তথা পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হয় ঢাকা। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে মুসলমানগণ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভে সক্ষম হয়। অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা গড়ে ওঠায় ঢাকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানগণ তাদের হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাবার আনন্দে মেতে ওঠে। নবাব স্যার সলিমুলস্নাহ পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দিন ঢাকার এক জনসভায় বলেন, "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এটা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্ম সাধনায় এবং সংগ্রামে।" অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়।

২) হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া : বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অবস্থান ছিল খুবই কঠিন। বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরাই এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝড় তুলেছিল। তারা একে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ হিসাবে বর্ণনা করে।

৩) ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ : হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন মোকাবেলা করার জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও নেতৃবৃন্দ ১৯০৬

সালে মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে হিন্দু -মুসলিম সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়।

৪) সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ করে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ভারতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিনত্মা-চেতনা বিসত্মৃত হয়।

৫) ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির বিজয় : বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক প্রভাবে ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি জয়যুক্ত হয়। ফলে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ভারতের বৃহত্তম দুটি সম্প্রদায় এর ফলে চিনত্মা-চেতনার দিক থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৬) ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ : বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকগণ কৌশলে কলকাতা কেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার সুযোগ লাভ করে। বঙ্গভঙ্গের ফলে সকল পেশাগত শ্রেণী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭) সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি : বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। হিন্দুরা বঙ্গবঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব

সিমলা দৌত্যের (১৯০৬ খ্রি.) সাফল্য ভারতীয় মুসলমান নেতাদের নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল । এরই পরিণতি হিসেবে ১৯০৬ – এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহের উদ্যোগে মুসলিম লীগের জন্ম হয় । তবে এটি ছিল এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল ।

সৈয়দ আহমেদের অনুগামীদের উদ্যোগ :

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর (১৮৯৮ খ্রি.) পর তাঁর অন্যতম দুই ঘনিষ্ঠ অনুগামী **ভিকার – উল্ – মুলক** ও **মহসিন- উল্ – মুলক** এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মুসলিম – স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের কথা চিন্তা করেন । এই উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁরা লক্ষ্ণৌতে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন । তবে তাঁদের এই প্রথম প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি ।

ভিকার-উল-মুলক – এর পত্র :

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাহারানপুরে একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায় । তবে ওই বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অক্টোবর মাসে **পাইওনিয়ার** পত্রিকার সম্পাদককে লেখা **নবাব ভিকার – উল – মুলক** – এর একটি পত্র । ওই পত্রে নবাব লেখেন , সংখ্যালঘু হিসেবে ভারতীয় মুসলিমদের নিজস্ব চাহিদাগুলি সরকারের কাছে উপস্থাপন করার জন্য কতকগুলি উপায় অবশ্যই বার করতে হবে । এইভাবে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলিমসমাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় ।

রাজনৈতিক দল গঠনের দাবি :

সিমলা দৌত্যের প্রাক্কালে মুসলিম নেতৃবৃন্দ লক্ষ্ণৌতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে (১৬ সেপ্টেম্বর , ১৯০৬ খ্রি.) নিজ সম্প্রদায়ের জন্য একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীরভাবে আলোচনা করেন । পরে ১ অক্টোবর **সিমলা দৌত্যে** মুসলিম প্রতিনিধিবর্গ বিষয়টি গুরুত্বসহকারেই **লর্ড মিন্টোর** কাছে উত্থাপন করেন । এই দৌত্য প্রসঙ্গে **আগা খাঁ** তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন — সিমলা বৈঠকে যোগদানকারী মুসলিম নেতারা এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে , একটি স্বতন্ত্র সংগঠন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ওপরেই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ।

মুসলিম লীগ গঠন :

অবশেষে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকার – উল – মুলক – এর সভাপতিত্বে প্রায় আট হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঢাকায় **' মহামেডান শিক্ষা সম্মেলন '** – এ সর্বভারতীয় **মুসলিম লীগ** প্রতিষ্ঠিত হয় । **আগা খাঁ** লিগের প্রথম **সভাপতি** এবং **মহসিন – উল্ – মুলক** ও **ভিকার – উল – মুলক** যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য / প্রভাব / গুরুত্ব

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতে যে সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ এর জন্ম দিয়েছিল তাতে ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় রাজনীতিতে তথা ভারত ইতিহাসে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল তার বিষময় পরিণতি হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারত ব্যবচ্ছেদ ঘটে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যে প্রতিবন্ধকতা :

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করে । মুসলিম লীগের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত রাখা । এতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হওয়ায় জাতীয় আন্দোলনগুলি ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

পৃথক রাজনৈতিক পথ :

মুসলিম লীগের গঠন ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে **জাতীয় রাজনীতির মূল ধারা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক স্বতন্ত্র পথে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান** করতে উৎসাহিত করে । জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু- মুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্বের দাবিকে লিগ নস্যাৎ করে দেয় । মুসলিম লীগের বিভিন্ন কার্যকলাপে সম্প্রদায়িক ভেদনীতির সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ সেই সুযোগের সদব্যবহার করে জাতীয় আন্দোলনকে সহজেই অবদমিত করে রাখে । যেমন — বঙ্গভঙ্গ – বিরোধী আন্দোলনে লিগের পরোক্ষ নির্দেশে মুসলমান সম্প্রদায় প্রচ্ছন্নভাবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করায় আখেরে সুবিধা হয় ব্রিটিশের ।

বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বের উদ্ভব :

লীগ প্রমাণ করতে চায় যে , ভারতবাসীকে একটি জাতিতে **ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়** । হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক সত্তা , যাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো সম্ভাবনাই নেই । এই তত্ত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত শক্ত করে , যার পরিণতি মোটেই সুখকর হয়নি । লীগের প্রচ্ছন্ন মদতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসারের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ইস্তেহার বিলি করা হয় । এইসব ইস্তেহারগুলিতে তীক্ষ্ণ ভাষায় হিন্দুত্ববাদের বিরোধিতা করায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ে।

অভিজাত মুসলিমদের প্রাধান্য :

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায় বাঙালি মুসলমানরা মূল উদ্যোগ নিলেও বাংলার সঙ্গে এই লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না । বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় ও মুসলিম লীগের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । লীগে মূলত উত্তর ভারতের অভিজাত মুসলিমদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল ।

জমিদার শ্রেণির স্বার্থরক্ষা :

মুসলিম জমিদার ও জোতদার শ্রেণির সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষায় লিগ যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। লীগের লক্ষ্য বা কার্যপদ্ধতিতে ভারতের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি।

লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিমলীগের অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক "লাহোর প্রস্তাব" পেশ করেন। বিপুল পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৪ মার্চ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

নিচে লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হলো:

০১। ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।

০২। উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের সমস্ত অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমন্বয়ে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন করতে হবে। এবং এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

০৩। ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের সাংস্কৃতিক শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।

০৪। দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পারিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব:

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে শোষিত, উপেক্ষিত এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার

প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে উঠে আসে। মূলত লাহোর প্রস্তাবের পর থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের পট-পরিবর্তন শুরু হয়। নিচে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

০১। **দ্বিজাতি তত্ত্বের সূচনা:** ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংখ্যালঘু মুসলমানরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হয়। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য লাহোর প্রস্তাবে "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতির দাবি করা হয়। দাবির মূল কথাই হলো হিন্দুদের জন্য একটি রাষ্ট্র এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে হবে। এ নীতির প্রেক্ষিতেই মোহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোষণা দেন।

০২। **স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা:** লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলার বাঘ এ.কে. ফজলুল হক বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন। লাহোর প্রস্তাব পাশ হলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে নতুন স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। যা ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

০৩। **মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি:** ইংরেজ আমল শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানদের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। মুসলমানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে বাস করা শুরু করে। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে। এই প্রেক্ষিতে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হলে মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার উপলব্ধি ঘটে। যা স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

০৪। **ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি:** লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় উপমহাদেশকে ভেঙ্গে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে ১৫ আগষ্ট ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

০৫। **মুসলিম জাতিয়তাবাদের উন্মেষ:** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তীব্র আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে মনবিলে মকসুদের দিকে এগিয়ে যায়। ইংরেজদের

বিরুদ্ধে আন্দোলনে এ মুসলিম জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

০৬। **ধর্মীয় ঐক্য সৃষ্টি:** ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগ তেমন ভালো ফল করতে পারেনি। এতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বিচলিত হয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে লাহোরে অধিবেশন ডাকেন। এ অধিবেশনে মুসলমানদের অধিকারের দাবিতে এ.কে ফজলুল হক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যা লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে ভারতের সকল মুসলিম এটাকে স্বাগত জানায় এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, লাহোর প্রস্তাব ছিল মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রস্তাব, যা ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠন করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

দ্বিজাতিতত্ত্ব বৈশিষ্ট্য : ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের সম্মেলনে জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করে যা পাকিস্তান গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকে। দ্বি-জাতী তত্ত্ব মলত ভারতীয় মসলমানদের আলাদা নির্বাচনী অধিকার রক্ষার জন্য দেয়া হয়। এই তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু ছিল এই যে হিন্দু মুসলমান আলাদা জাতি সত্ত্বা। তারা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং চিন্তার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সর্বপ্রথম সার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭ – ১৮৯৮) মুসলিমদের আলাদা জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন শুরু করেন। তারপর ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল দ্বি-জাতী তত্ত্বের তাত্ত্বিক দিক ব্যাখ্যা করেন। এরপর থেকে মুসলিম ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। অবশেষে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে হিন্দু এবং মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রভাব: দ্বিজাতি তত্ত্বের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ

সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনাশ : দ্বিজাতিতত্ত্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে বিনষ্ট করে । এই একপেশে ধারণা অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ভেঙে দেয়

ভারত বিভাজন : দ্বিজাতিতত্ত্বের চরম পরিণতি রূপে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ দু – টুকরাে হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম দেয় ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবাষ্পে স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লক্ষ নির্দোষ , অসহায় হিন্দু ও মুসলিম প্রাণ হারায় ।

আর্থিক প্রগতিতে বাধা : দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণার জন্যই আজও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে প্রগতি ও উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে ।

দেশ বিভাজনের পর দেখা গেল, পাকিস্তানে মুসলমানের চেয়ে ভারতে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি। আবার পাকিস্তানের পূর্ব অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু রয়ে গেছে। তার মানে যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়েছিল তা পুরোটাই বিফল। এমতাবস্থায় জিন্নাহ এবং নেহেরু দুজনেই সুর পাল্টালেন। তখন তারা বললেন, ভারত এবং পাকিস্তান দুটিই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ! তাহলে আগে কি সমস্যা হয়েছিল? আগেও তো হিন্দু মুসলমান ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করত। তাহলে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, শুধুমাত্র ক্ষমতালাভের মোহে অথবা ব্রিটিশদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করতেই এত বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীকে বিভাজিত হতে হলো? কারণ কথায় বলে না, একই জঙ্গলে দুই বাঘ রাজত্ব করতে পারে না।

দেশ ভাগের পর কোন দেশেরই সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। আমাদের মানে, ততকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কি কোন পরিবর্তন হয়েছিল? যদিও পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষই ছিল মুসলিম তারপরও তাদের সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। সবচেয়ে বড় বৈষম্য ছিল ভাষায়। তাই তো দেশভাগের মাত্র চার বছর পর ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যায় ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি। বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল আমাদের সোনার ছেলেদের।

সবশেষে তো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বৈষম্য আর শোষণের চূড়ান্ত প্রতিবাদ রূপে ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্ত ও হাজারো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা পেল আমাদের বাংলাদেশ।